বাংলার পোড়ামাটি-মন্দির

ডেভিড ম্যাককাচিয়ন

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিশারদ গুরুসদয় দত্তই প্রথম ১৯৩০ সালে বাংলা পোড়ামাটির মন্দিরের দিকে সোৎসাহ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এর আগে এগুলোকে বেগলারের মতো পুরাতাত্ত্বিক কিংবা ফার্গুসনের মতো শিল্প-ঐতিহাসিকেরা নিতান্ত তাচ্ছিল্য সহকারে উল্লেখ করতেন—প্রাচীন ও মধ্যযুগই তাঁদের মনোযোগ অধিকার করেছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী যে-কোনো জিনিশকেই তাঁরা বিকৃত এবং মনোযোগের অযোগ্য মনে করতে চাইতেন। তৎসত্ত্বেও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বাংলা দেশের বহু উৎকৃষ্ট পোড়ামাটি-অলঙ্কৃত মন্দিরের সংস্কার-সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল, যেমন বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া), বড়নগরে (মুর্শিদাবাদ), গুপ্তিপাড়ায় (হুগলি), মথুরাপুরে (ফরিদপুর) এবং পালপাড়ায় (নদীয়া)—এর কোনো কোনোটা অন্যথায় হারিয়ে যেত পুনরুদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা না রেখে।

এখন এটা বোঝা গেছে যে, বিকৃতভাবে টিকে-থাকা দূরে থাকুক, বাংলা দেশের পোড়ামাটির মন্দির বস্তুত নতুন সূচনা। পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের সমকালীন মিনিয়েচার চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এখানেও এদের বিবর্তনের তাগিদ এসেছে প্রথমত মুসলমানদের থেকেই এবং তারপরে তাগিদ এসেছে বৈষ্ণবধর্মের রাধাকৃষ্ণ-কাল্টের পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে। পোড়ামাটির ফলকের সাহায্যে মন্দির এবং স্তূপ অলঙ্কৃত করার প্রথা অবশ্য বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল সর্বভারতীয় বৌদ্ধ এবং হিন্দু ক্ষেত্রে (যেমন মীরপুর খাস, ভিতরগাওঁ, রঙমহল, শাহেদমাহেদ, অহিচ্ছত্রে)। বাংলা দেশে এর ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ৯ম শতাব্দীর পাহাড়পুরের মন্দিরে: ১৯৩০ সালে এই স্থানের উৎখননে পোড়ামাটি-ভাস্কর্যের এযাবৎ-কাল অজ্ঞাত রীতি বা স্কুলের বিস্ময়কর উদ্ঘাটন হয়েছে, এই স্কুল তো এখন জানা গেছে বিহারের নালন্দা থেকে কুমিল্লার নিকটস্থ ময়নামতী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কিন্তু এই স্কুল এবং বাংলাদেশের পরবর্তী পোড়ামাটির মন্দিরের মধ্যে কোনো ধারাবাহিক যোগাযোগ নেই। পাহাড়পুরের ফলক, অধিকাংশই এক ফুট লম্বা এবং ততখানিই উঁচু, সৌধের চারপাশে লম্বা লম্বা সারিতে সাজানো থাকে,—আর এদিকে পরবর্তীকালের পোড়ামাটির ফলকগুলো আকারে ছোট (৬″×৪″) এবং সম্মুখভাগের সর্বত্র তারা ছড়ানো থাকে। পাহাড়পুরের শিল্প জোরালো এবং স্থূল, নানারকম গোলাকার অভিক্ষেপ সংবলিত—আর পরবর্তীকালের মন্দিরের শিল্প সূক্ষ্ম এবং মসৃণভাবে খোদাই-করা। উপরন্তু

boipattor.in

এই প্রাচীন শিল্প মুসলমানেরা মঠগুলোকে বিনষ্ট করার বহু আগেই সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল (১১শ শতকের সংস্কার-কার্য থেকে দেখা যায়, নতুন ফলক আর সুলভ নয় তখন) এবং প্রাক-মুসলিম যে-সমস্ত হিন্দু বা জৈন মন্দির এখনও টিকে আছে, তার কোনোটাতে অন্তত এর হদিশ মেলে না—এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে খোদাই-করা ইটে প্লাস্টারের (স্টুকো-র) সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়।

মুসলমানেরাই পোড়ামাটি অলঙ্করণের রীতি এবং নকৃশা (বা স্থাপন কৌশল) সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। পাণ্ডুয়া, গৌড় কিংবা অন্যত্র (১৪শ থেকে ১৫শ শতাব্দীতে) মসজিদ এবং সমাধি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা পোড়ামাটি শিল্পকে নিয়ে গেলেন বহিরঙ্গ স্থাপত্যের কাছাকাছি—সূক্ষ্মভাবে খোদাই, সুদীর্ঘ বন্ধনের মধ্যে বিস্তৃত, দেওয়ালে মিহ্‌রাবে এবং সুচোঁলো খিলানের ওপর বর্গক্ষেত্র পরিমাপ ফ্রেমের ভিতরে কুলুঙ্গি-সদৃশ প্যানেল। বিষয়বস্তু ছিল অমূর্ত—একজোড়া গোলাপ, ঝুলন্ত বাতি, পদ্মবৃন্ত, পরস্পরজড়িত জ্যামিতিক নকৃশা ইত্যাদি। এই ধরনের সজ্জাবিশিষ্ট প্রথম মন্দির হচ্ছে মেদিনীপুরের ঘাটালের ছোট্ট সিংহবাহিনী মন্দির (১৪৯০ খৃ), কিন্তু পোড়ামাটির কাজ সেখানে সামান্য এবং হয়তো পরবর্তী হস্তক্ষেপও আছে। ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে অবশ্য যশোহরের রায়নগর (১৫৮৮ খৃ) মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ (১৫৯০ খৃ), হুগলির বৈঁচিগ্রাম (১৫৮০ খৃ) কিংবা বর্ধমানের বৈদ্যপুরে (১৫৯৮ খৃ) এবং বহু তারিখবিহীন মন্দিরে কিংবা যাদের বিবরণী পাওয়া যায় কিন্তু এখন অবলুপ্ত সেই সমস্ত মন্দিরে এই লক্ষণ খুব স্পষ্ট দেখা গেল : মন্দিরগুলো ব্যাপকভাবে পোড়ামাটির ফলকে অলঙ্কৃত। মন্দির-অলঙ্করণের এই প্রাথমিক পর্যায়ে দুটো ধারা দেখা গেল : এক, মসজিদের নকৃশার সঙ্গে নৈকট্য, সেই সাথে পরীক্ষামূলকভাবে নির্মিত কিছু মূর্তি (বৈদ্যপুর, বৈঁচিগ্রাম) এবং দুই, অনেক দেবদেবীমূর্তির সমাবেশ (রায়নগর, গোকর্ণ)। ময়ূরভঞ্জের হরিপুরগড়ে রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ কর্তৃক আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে (যে-বছর বারিপদা-র জগন্নাথ মন্দিরে[১] তাঁর নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছিল) নির্মিত রসিক রায় মন্দিরেই দেখা যায় পরিণত আলঙ্কারিক নকৃশা, যার মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা, নীচের দিকে সামাজিক দৃশ্যাবলি এবং পাশে অতিরিক্ত কয়েকটা দেবমূর্তি (অবশ্য খিলান দরজা বরাবর রয়ে গেছে ফুলের নকৃশা), যেমনটি দেখা যায় সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক ব্যাপী।

সুতরাং এই শিল্পের অভ্যুদয় ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃ) ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের মুখোমুখি এবং এই যোগাযোগ সম্পর্কে অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণেরও অভাব নেই। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের যে-সব মন্দিরে পোড়ামাটি-অলঙ্করণের প্রাচুর্য দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং অলঙ্কারগুলিও বহুলাংশে বৈষ্ণব। সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি

boipator.in

যে ছকটি চোখে পড়ে, তাতে সম্মুখভাগের নিম্নপ্রান্ত বরাবর এক সারিতে থাকে ভাস্কর্যের সমাবেশ, কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসের মৃত্যু পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার কাহিনী, আর প্রবেশপথের উপরিভাগে থাকে বড় বড় ফলকে বিধৃত যুদ্ধক্ষেত্রের পরিব্যাপ্ত দৃশ্য, রাম-লক্ষণ-বানরসেনার সঙ্গে রাবণ-কুম্ভকর্ণ-রাক্ষসকুলের লড়াই। এ ছাড়া মন্দিরের অন্যান্য গৌণ অংশগুলোতে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারমূর্তি, রাধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণবলরামের যুগল মূর্তি এসব তো হামেশাই দেখা যায়। তদুপরি এইসব মন্দিরগাত্রের জীবনস্পন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যময় পুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং তার সামগ্রিক ভাব বস্তুত রাধাকৃষ্ণচর্চার ভাবাবেশকেই প্রতিবিম্বিত করে। স্থান-সম্পূরণের উদ্দেশ্যে বহুল-ব্যবহৃত একটা বিষয় হল কীর্তন গান ও নৃত্য—বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলোতে দেখা যায় সারি সারি খোলবাদক ও উন্মত্ত নৃত্যশিল্পীর মেলা এবং এইসব মূর্তির ছন্দোময় উচ্ছ্বাসেই যেন প্রথম যুগের পোড়ামাটি-শিল্পের মূল সুরটি বেজে ওঠে।

এ-বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই একে জনগণের শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। গুরুসদয় দত্ত-র প্রধান বক্তব্য এই যে, প্রাক-মুসলিম বাংলাদেশের শিল্পসংস্কৃতিকে 'গ্রাস করেছিল গুপ্ত এবং পাল ঐতিহ্যের আকারে সাম্রাজ্যবাদী পুরোহিততান্ত্রিক সর্বভারতীয় সংস্কৃতি'; অন্যদিকে মুসলিম যুগে জন্ম নিয়েছিল 'এক দেশজ ভাস্কর্য, বাংলা দেশের নিজস্ব উপকরণ পোড়া এবং কাঁচা মাটির তৈরি, বাংলার দেশজ শিল্পীদের হাতে মুক্ত স্বাধীন আবেগে রূপায়িত, যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এক স্বতন্ত্র জাতীয় চিন্তাধারা—বাংলা-দেশের জীবনবোধ, বাংলাদেশের প্রকৃতিচিন্তা, বাঙালীর বিশ্বভাবনা'।[২] ডঃ এ. এইচ. দানি তাঁর 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল'-গ্রন্থে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে (১৩৫৭ খৃ) প্রাপ্ত পোড়ামাটির অলঙ্করণকে বৈচিত্র্য এবং প্রাণবত্তার কারণে 'লোকশিল্প' আখ্যা দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে তুলনা করেছেন পাহাড়পুরের পোড়ামাটি-শিল্পের।[৩] পাহাড়পুরের পোড়ামাটির শিল্পকে সাধারণত লোকশিল্পই বলা হয়ে থাকে। বলা হয়, ঐ শিল্পে প্রতিফলিত হচ্ছে 'এক স্থানীয় দেশজ ভাবধারা, প্রেরণা, কল্পনা ও আবেদনের দিক থেকে যা সর্বজন-গ্রাহ্য'[৪] এবং ঐ শিল্পই রুখে দাঁড়িয়েছিল 'প্রাক্তন যুগের এবং উচ্চবিত্ত-শ্রেণীর বিধিবদ্ধ শিল্পের বিরুদ্ধে'।[৫]

বিধিবদ্ধ ব্রাহ্মণ্য শিল্পের সঙ্গে কোনো লৌকিক দেশজ শিল্পের পার্থক্য যতক্ষণ অর্থপূর্ণ, ততক্ষণ অবধি অবশ্যই বলা সংগত যে মুসলমানদের আগমন ব্রাহ্মন্যতন্ত্রের কর্তৃত্ব নষ্ট করে দেশজ ভাবধারাকে মুক্ত করেছিল। সুলতানী আমলেই প্রথম বাঙালী নামে একটি স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হল (যে-জাতির পূর্বে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না), নিজস্ব ভাষা সাহিত্য ও স্থাপত্যের অধিকারী একটি জাতি। কাজেই এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই যে, মন্দির ও মসজিদের পোড়ামাটির শিল্প এবং সেই সঙ্গে তাদের স্থাপত্যরীতি (বিশেষত যেগুলো বাঁশের-ছাউনি-দেওয়া বাঁকানো-কার্নিশযুক্ত কুটিরের উপর ভিত্তি করা)

boiboi.in

একান্তভাবেই জাতীয়চরিত্র-বিশিষ্ট। ভারতের আর কোথাও এই পোড়ামাটির অলঙ্করণ, এই রূপাবয়ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মুঘল আমলে পোড়ামাটির অলঙ্করণ যখন মসজিদ থেকে মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ল, বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্য জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে দিল্লি থেকে বাদশাহী রীতিনীতি আমদানি করল, পোড়ামাটি ছেড়ে ধরল চকচকে প্লাস্টার, বাঁকানো কার্নিশ ত্যাগ করে গ্রহণ করল সোজা কার্নিশ। এর পাশাপাশি মন্দিরগুলোই হল দেশজ ধারার বাহক।

এতৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, পোড়ামাটির মন্দিরকে লোকশিল্প বলা কতখানি সংগত? লোকশিল্প বলা হয়েছে তাকেই যা অজ্ঞাত শিল্পীকুলের সৃষ্টি ঐতিহ্যের ধারার (ব্যক্তিগত শিল্প ঠিক বিপরীত) এবং যা ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা নয়, সর্বসাধারণের উপভোগ্যতার জন্য নিয়োজিত। এই সংজ্ঞার মাপকাঠিতে রেনেসাঁস-পরবর্তী ইওরোপীয় শিল্পকলা বিচার করতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু মধ্যযুগীয় সমাজগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এতটা সহজ নয়, সেখানে শিল্পমাত্রই ঐতিহ্যের অনুগামী এবং রাজন্যবর্গের বা অভিজাতকুলের পৃষ্ঠপোষকতা বহুলাংশে সর্বসাধারণেরই কল্যাণার্থে—মন্দির বা ক্যাথেড্রালগুলি যার দৃষ্টান্ত। লোকশিল্পের আরো দুটো লক্ষণ হিসাবে বলা যায় আকারের ক্ষুদ্রতা ও ব্যয়ের স্বল্পতা। সব পোড়ামাটি-শিল্পকেই লোকশিল্প আখ্যা দেওয়ার ঝোঁকটা অংশত এইকারণে যে পোড়ামাটি-শিল্প শস্তা ও ভঙ্গুর এবং অংশত এই কারণেও যে, অদ্যাবধি গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত খেলনা পুতুল পাওয়া যায়, সেইসব সুপ্রাচীন মূর্তি-গুলির সঙ্গে এই শিল্পের একটা ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু, যদিও উন্নত পালযুগের প্রস্তর-নির্মিত শিল্পকলার তুলনায় পাহাড়পুরের শিল্প স্পষ্টতই অনেক বেশি মুক্ত ও স্বাধীন, মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যত্র, যথা ভিতরগাঁও বা অহিচ্ছত্রে, পোড়ামাটি শুধু পাথরের বিকল্প উপকরণ মাত্র।

মধ্যযুগের বাংলা দেশে পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে পোড়ামাটির ব্যবহার হয়ে পড়েছিল অনিবার্য, এবং যেসব জায়গায় পাথর মিলত (যেমন বীরভূমের কোনো কোনো অঞ্চলে অথবা বর্ধমান জেলার উত্তরভাগে) সেখানে পাথর খোদাই করা হয়েছে হুবহু পোড়ামাটির শিল্পের অনুকরণে। একই কথা প্রযোজ্য মন্দিরের দরজায় বা অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপে (যেমন হুগলির আটপুরে বা নদীয়া জেলার বীরনগরে) কাঠের ব্যবহার প্রসঙ্গে। বস্তুত পাহাড়পুরেও কিছু প্রস্তর-ভাস্কর্যে লক্ষ করা যায় পোড়ামাটি শিল্পের সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য। পোড়ামাটির মন্দিরকে সেরকম্ ব্যয়সাধ্য বলাটাও ঠিক নয়, যেরকম বলা যেতে পারে অনেক লোকশিল্প-সম্পর্কে—শোলার পুতুল, কাগজের মুখোশ, পট বা বারোয়ারি পূজার মৃৎমূর্তি ইত্যাদি। কিন্তু লোকশিল্প প্রসঙ্গে খরচের প্রশ্নটা আবশ্যিক কিছু না, যেহেতু লৌকিক দেবতার মূর্তিনির্মাণে ব্রোঞ্জ বা পাথরের ব্যবহারও করা হয়ে থাকে।

boipattor.in

অন্তপক্ষে পোড়ামাটির মন্দিরগুলো জনগণের জন্য নির্মিত হয় নি, কেননা সেগুলো নির্মিত হত উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ফরমায়েশ অনুযায়ী, মূলত তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যই। অল্প কয়েকটিমাত্র মন্দির—সেগুলোও অধিকাংশই পরবর্তীকালের—তৈরি হয়েছিল পাড়ার লোকেদের চাঁদার অর্থে, অথবা বারোয়ারি পূজার জন্য; অধিকাংশ লৌকিক দেবতার স্থান হত গাছতলায় বা মাটির চালাঘরে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি মন্দিরগুলোয় অবশ্য দেবদর্শন ছিল অবারিত (অজলচলরা চত্বরের বাইরে থেকে দর্শন সারতেন), এবং বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে সংযুক্ত উৎসব, যেমন ঝুলন দোল রথযাত্রা বা গাজনে সকলেই অংশগ্রহণ করতেন। যদিও কোনো শিল্পশাস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যায়নি, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট দেওয়ালের কোনো কোনো অংশে অলঙ্করণের ধরনগুলো রীতিমতো নিয়মাবদ্ধ ছিল। যেমন নিম্নাংশ বরাবর ঐহিক দৃশ্যাবলি, ওপরে কৃষ্ণলীলা (এবং কদাচিৎ রামলীলা); খিলানের ওপরের ফলকে পৌরাণিক যুদ্ধ বা কৃষ্ণলীলা; অবতারগণ ও অন্যান্য দেবতা পাশের ছোট ছোট ফলকে। এইসব নিয়ম তাই বলে অলঙ্ঘ্য নয়। যেমন শুম্ভ-র সাথে যুদ্ধরতা দুর্গাকেও দেখা যায় নীচের ধর্মনিরপেক্ষ দৃশ্যাবলির মধ্যে। অবশ্য হিতেশরঞ্জন সান্যালের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে ছকের অদলবদল এবং বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়েছে অর্থপ্রদানকারীর মর্জি-অনুযায়ী, শিল্পীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়। যদি একথা না বলি যে তাবৎ নব-বৈষ্ণব-আন্দোলনকেই জনগণ জোর করে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল, তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছে সেই আনুকূল্যে যাকে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতারই পরবর্তী মধ্যযুগীয় রূপ বলা যায়। কখনও ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য, কখনও বা পাঁচজনের। এই পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুপুর বা বর্ধমানের রাজাদের মতো শক্তিশালী রাজা-রাজড়া থেকে শুরু করে সারা দেশে ছড়িয়ে-থাকা ছোট ছোট রাজা জমিদার এবং (বিশেষত পরবর্তীকালে) তন্তুবায় বা কাংস্যকার-জাতীয় সকল ব্যবসায়ী পর্যন্ত। যে সম্প্রদায় ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, সেই সম্প্রদায়ই মন্দির শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যদি কাব্যকে সাহিত্য, আর পটুয়াসংগীতকে লোককৃতি হিসেবে ধরে পার্থক্য নিরূপণ করি, তাহলে অনুরূপ পার্থক্য থেকে যায় মন্দির-শিল্পর সঙ্গে মাটির পুতুল এবং ঘোড়াগুলোর।

কিন্তু আরো এক দিক দিয়ে পার্থক্য বিচার সম্ভব, শিল্পের দিক দিয়ে; যদিও সেটা সময় সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। পোড়ামাটি মন্দিরের ভাব এবং শৈলীর ক্ষেত্রে একটা লোককৃতি-সুলভ চরিত্র স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। সেই যুগে বাদশাহী শহুরে সমাজের মতো উচ্চ বর্ণ বা শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সাংস্কৃতিক দূরত্ব অত বিপুল ছিল না, এবং শিল্পীরা দরবারেও বাস করতেন না বা উচ্চমর্যাদাও ভোগ করতেন না, বরং সাধারণ্যেই মিলে মিশে থাকতেন। সমগ্র

boipatter.in

হিন্দুসংস্কৃতিই ছিল ভূমিভিত্তিক গ্রামীন সংস্কৃতি, আর তার অর্থনীতি নির্ভর করত সেই সমস্ত স্থানীয় জমিদারীর ওপর, দরবারী সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করার উপযোগী সম্পদই যাদের ছিল না। ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ, এই দুই সমৃদ্ধ রাজধানীই তো ছিল মুসলমানদের অধিকারে। পট অঙ্কণ, পুতুল নাচ, যাত্রা, কথকতা, মুখোশ নৃত্য এবং অন্যান্য লৌকিক মাধ্যমগুলোর বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি যে ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করা হত, সেই একই ঐতিহ্য থেকে পোড়া-মাটি-মন্দিরের বিষয়বস্তুও সংগৃহীত হত। সুতরাং এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে পোড়ামাটি মন্দিরে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান: কৌতুককর এবং ছন্দোময় বিকৃতি বা ভঙ্গ, বলিষ্ঠ পিণ্ড বা ম্যাস্ ও রেখার সরলীকরণ, অকপটতা ও স্পষ্টতা। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের পেছন দিকে নীচের সারিতে আছে, রাজারা সব ভৃত্যবর্গের সামনে নবাবী আরামের আমোদজনক আতিশয্যের ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। ইংরেজসাহেবদের সূক্ষ্মভাবে দেখা হয়েছে, কোমরে হাত দিয়ে আদেশকারীর ভঙ্গিতে, অথবা ব্রিচেস এবং লম্বা টুপি পরে বসে বসে পাইপ টানতে ব্যস্ত। স্থূলকায় কুম্ভকর্ণ বিশাল গদাচালনা করছে এবং খুবই চটপট বানরদের গিলে ফেলছে (তারা আবার সঙ্গে সঙ্গে কান দিয়ে বেরিয়ে আসছে)—এটা একেবারেই লৌকিক মানসসঞ্জাত একটি কল্পনা। তেমনি আছে, ঝটিকা-বেগে ধাবমান রাবণের রাক্ষসসৈন্য দন্তপংক্তি প্রদর্শন করে মুখব্যাদান করছে। যোগী এবং বানরদের প্রায়ই অদ্ভুত ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে, বাহুমূলের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে অথবা মাথা নীচের দিকে করে গড়িয়ে পড়ছে, কিংবা ঝাড়ুহাতে দাসী হয়তো আধবোজা জানলা দিয়ে কিম্ভূতভাবে উঁকি মারছে। দেবকুল যা দেখানো হয়েছে তার মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দেবকুলের বাইরে ঢেঁকিপৃষ্ঠে নারদ, মনসা, শীতলা এবং অন্যান্য লৌকিক দেবতারও উপস্থাপনা করা হয়েছে। মূর্তিনির্মাণের মধ্যে ভুল-ত্রুটিও পাওয়া যায় বিশেষত পরবর্তীকালে; এবং অর্থ-না-বুঝে নিছক অনুকরণের ফলে, রাবণের রথ শেষ অবধি কুমীরে পরিণত হয় (আসল রথটিতে সামনের দিকে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে একটি মকরমুখ দেওয়া ছিল)। শিল্পীরা যেসব জানোয়ার চোখেও দেখেননি, যেমন সিংহ বা গণ্ডার, সেগুলোর চেহারা হয়ে গেছে আজগুবি। ভাগীরথিবক্ষে ভাসমান ইওরোপীয় জাহাজগুলো হয়ে গেছে কাঠামো, মাস্তুল, পোর্টহোল, মাঝিমাল্লা পাহারাদারদের সমাবেশমাত্র, আকারসঙ্গতির বালাই নেই (হাতির মুণ্ড মানুষের মাথার চেয়ে মোটেই বড় হয়নি)। শিকারের দৃশ্যগুলো প্রায়ই অতিশয় সরলভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে—হতভাগ্য শিকারীর মাথায় বাঘের থাবা বসানো। একই সরলতাদোষে দুষ্ট ইওরোপীয় সাহেবের রূপায়ন—সর্বদাই নৌকো বা গাড়িতে ভ্রমণকালে তার বাহু কোনো যুবতীকে বেষ্টন করে আছে—এবং কখনো কখনো গাড়ির অগ্রভাগে নর্তকদের পুরো একটি দল চলেছে!! তাই বলে পোড়ামাটি মন্দিরের সব কাজই কৌতুকময় অতিরঞ্জন বা অতি-সারল্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়।

boiRboi.in

অনেক কাজেই দেখা যায় পালযুগের শিল্পের সঙ্গে তুলনীয় বৈদগ্ধ্য এবং সুষমা। এবং বাস্তবিক, গুরুসদয় দত্ত যেমন বলেছেন, ঐসব কাজ পালযুগের সঙ্গে ধারাবাহিকতার সূত্রে যুক্ত যদিও সাধারণভাবে তার মধ্যে নৈপুণ্য বা বস্তুনিষ্ঠা তুলনায় কিছু কম। পালযুগের অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ সুগোল লাবণ্যমণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তির পার্শ্ববর্তী অনুচরদের তুলনায় পোড়ামাটির লক্ষ্মী সরস্বতী যেন বিশুদ্ধ একটি ছকে বাঁধা, যেন নিতান্তই জমি বা তলের ছন্দোময় বিন্যাস।

পোড়ামাটি-শিল্প-শৈলীকে কালিক-পর্যায় এবং আঞ্চলিক রীতির দিক থেকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। সময়ের দিক থেকে প্রথম যুগ (ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতক) মধ্যযুগ (অষ্টাদশ শতক) এবং পরবর্তী যুগ (উনিশ শতক)—পৃথকভাবে এই তিন যুগের শৈলীর কথা বলা যেতে পারে। প্রথম যুগের কাজগুলো বলিষ্ঠ, ঋজু এবং ছন্দোময়, মুখগুলো সাধারণত পাশ থেকে দেখানো আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো (সন্ধিস্থলে গভীরভাবে খোদাই-করা) শক্তিমত্তায় স্ফীত। এই কাজ সবচেয়ে ভালো দেখা যায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলোয় (বাঁকুড়া), বিশেষত শ্যামরায় (১৬৪৩ খৃ) এবং জোড়বাংলা (১৬৫৫ খৃ) মন্দিরে। কিন্তু এছাড়াও দেখা যায় ঘুড়িসা-র (১৬৩৩ খৃ, বীরভূম) শিবমন্দিরে (আগে ছিল রঘুনাথের মন্দির), বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে (১৬৭৯ খৃ, হুগলি,) দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরে (১৬৬৯ খৃ, নদীয়া), চেলিয়ামা-র রাধাবিনোদ মন্দিরে (১৬৯৭ খৃ, পুরুলিয়া), যুগসরা-র শিবমন্দিরে (মুর্শিদাবাদ), এবং যশোরের নলডাঙা-রাজের পুরোনো মন্দিরগুলোতে। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায় এই বলিষ্ঠতা ক্রমেই শিথিল হয়ে এসেছে, এবং অবশেষে উনিশ শতকে এসে ইওরোপীয় প্রভাবে দ্রুত অবনতি লক্ষ করা যায়। মূর্তিগুলো হয়ে গেল গোল-গোল, পুতুলের মতো, বলিষ্ঠতা হল বিলুপ্ত, গতিতে এল শৈথিল্য বা আড়ষ্টতা, সজীবতা নয়। ছন্দ ও ডিজাইনের তুলনায় বিষয়বস্তুই হয়ে উঠল প্রধান, অভিনবত্ব এবং অদ্ভুতের অনুসন্ধানই মুখ্য। প্রকরণ ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ল, মূর্তিখোদাই-এর কায়দাটা হয়ে গেল এলোমেলো ; এমনকি মাটি-মেশানো এবং পোড়ানোর ব্যাপারেও নৈপুণ্যের অভাব দেখা দিল—মূর্তিগুলো হল অতিশয় ভঙ্গুর। অনেক মূর্তিই যেন রোমান ক্যাথলিক অধঃপতনের যুগের নিষ্প্রাণ সেন্টদের এবং ম্যাডোনার প্লাস্টার-মূর্তিগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। হেতমপুরের চন্দ্রনাথ শিব-মন্দির (উনিশ শতকের মাঝামাঝি, বীরভূম) এদিক থেকে অনন্য, তার সবকটি ফলকই ইওরোপীয় মডেলের অনুকরণ : হোমরা-চোমরাদের প্রতিকৃতি, সাধারণ জীবনচিত্র, সামরিক পোষাক-আশাক ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতকের শৈলী একটা বেশ বড় এলাকা জুড়ে একই ধরনের ছিল, যদিও বিষ্ণুপুরের শৈলীর সঙ্গে আশুতোষ মিউজিয়মে রাখা বরিশালের সতেরো শতকের প্যানেলগুলোর শৈলীর পার্থক্য অত্যন্ত পরিষ্কার। শৈলীর দিক থেকে বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের মিল আছে দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দির অথবা বোরাগারি-র গোপালমন্দিরের (হুগলি), এবং অনুরূপভাবে

boipattor.in

গুপ্তিপাড়া-র রামচন্দ্রের মন্দির বা বাঁশবেড়িয়া-র বাসুদেব মন্দিরের (দুটোই হুগলিতে) সঙ্গে যশোরের সপ্তদশ শতকের মন্দিরগুলোর। খুঁটিয়ে দেখলে এই তিনটে প্রধান ধারার মধ্যে আরো শ্রেণীবিভাগ লক্ষ করা যাবে নিঃসন্দেহে। আঠারো শতকে সবচেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছিল যে রীতির, তাকে হুগলি রীতি বলা যেতে পারে, যদিও সংলগ্ন জেলাগুলোতে বহু এলাকাব্যাপী এই শৈলী ছড়িয়েছিল। এই রীতিতে মন্দিরগুলো সাধারণত আটচালা (কখনো-বা পঞ্চরত্ন), তিনটে খিলান-করা দরজার ওপরে চাল দেওয়া, যুদ্ধদৃশ্য অলঙ্কৃত, দুইপাশে এবং সম্মুখভাগের প্রান্ত ধরে দুই-সারি ছোট ছোট মূর্তি, এবং নীচে সমসাময়িক দৃশ্যাবলি, ওপরে কৃষ্ণলীলা। এর ভালো ভালো নিদর্শন রয়েছে হুগলি জেলার জয়নগর, কোটালপুর, বাহিরগড়, পারুল, সাহাগঞ্জ, রাজবলহাট বা খেদাইল ইত্যাদি জায়গাগুলোতে ; আর হুগলির বাইরে মালঞ্চ ও দেবীচক (মেদিনীপুর), আমরাগরি ও ঝিকিরা (হাওড়া), এবং কেন্দুলিতে (নবরত্ন, বীরভূম)। বর্ধমান জেলার আঠারো শতকের অনুরূপ মন্দিরগুলোতে সাধারণত দেখা যায় দরজার ওপরে এবং নীচ বরাবর ফুলের নক্‌শা সাজানো। যশোর-ফরিদপুরে অষ্টাদশ শতকের পোড়ামাটি-মন্দিরে সপ্তদশ শতকের ছন্দোময় সজীবতা অক্ষুণ্ণ আছে। বড়নগরে (মুর্শিদাবাদ) অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আরেকরকম ধারা লক্ষ করা যায়, যার সঙ্গে হাতির দাঁতের কাজের অনেক মিল আছে। এই সব পার্থক্যগুলোর তালিকাবৃদ্ধি করে এরকম অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রীতির সুগঠিত নক্‌শার কথা ভাবা যেতে পারে, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত। অনেক সময় ব্যাপারটা অতিমাত্রায় আঞ্চলিক। যেমন, বর্ধমান জেলার সিঙারকোণ-এর কাছে কুমারপাড়ায় চারটে ছোট ছোট মন্দির পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত। তাদের সবকটিতেই দরজার ওপর একই রকমের চক্‌রা-বক্‌রা-কাটা নক্‌শা, দুপাশে ওপরের দিকে চৌকো ফলকে পদ্মের সারি, নীচের দিকে বিশেষ কয়েকটা উপাদান বা মোটিফের পুনরাবৃত্তি। কাছাকাছি রামনগর এবং পাতিলপাড়া গ্রামেও ঐ ধরনের মন্দির পাওয়া যায়। বর্ধমানের আরেকটি ধারায় আটচালা-ধাঁচের কিছু মন্দির আছে, যার বিশেষ কোনো সময় নির্দিষ্ট করা যায় না, দামোদরের দুই তীরে বিরাট এলাকায় বিস্তৃত। সে ধারায় পাওয়া যায় দরজার ওপরে পদ্মফুল ছড়ানো, তার মাঝে মাঝে বড় মূর্তি, অধিকাংশ পশুপক্ষীর, সামনের দিকে বাদবাকিটা ফাঁকা। এইসব নানারকমের শৈলী ও নক্‌শার শ্রেণীবিভাগ করলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে এগুলো ভ্রাম্যমান কয়েকটি পৃথক শিল্পীদলের সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে উৎকীর্ণ লেখাগুলো থেকেও এই-কথাই প্রমাণিত হয়।

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই মন্দিরের সামনে ওপরের দিকে তারিখ-ফলকে স্থপতির নাম (মিস্ত্রি, সূত্রধর), অনেক সময় তার গ্রামেরও নাম লেখার রেওয়াজ বৃদ্ধি পায়। এগুলো থেকে জানা যায় যে মন্দির-শিল্পীরা কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে আসতেন, যেমন মেদিনীপুর জেলার

boiparton.in

দাসপুর, বাঁকুড়া জেলার বালসি বা সোনামুখী, বর্ধমানের বানপাস, বা হুগলির সেনহাট থেকে, আর ছড়িয়ে পড়তেন বহুদূর পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, কালনা-র (বর্ধমান) প্রতাপেশ্বর মন্দির তৈরি করেছিলেন সোনামুখীর শ্রীরামহরি মিস্ত্রি (একদল মিস্ত্রির নেতা) ১৮৪৯ সালে। কিংবা সেনহাটের মিস্ত্রিরা তৈরি করেছিলেন উনিশ শতকের শেষদিকের কিছু মন্দির খারার-এ (ঘাটালের-কাছে)। কিংবা ১৮৯৯ সালে পাবনার শ্রীমধু মিস্ত্রি তৈরি করেছিলেন তরাস-এর বিশাল নবরত্ন-গোবিন্দ মন্দির। দাসপুরের একদল মিস্ত্রির নেতা শ্রীঠাকুরদাস শীল-এর নাম পাওয়া যায় শুধু দাসপুরের মন্দিরেই নয়, বলরামপুরের এবং চকবাজিত (লাওডা-র কাছে) এবং দাসপুরের কাছে সুরথপুরের মন্দিরগুলোতেও। অনেকসময় একাধিক মিস্ত্রির নামও লেখা থাকে। যেমন, ১৮৬৯ সালে আনন্দপুরের (মেদিনীপুর) বাঘ-পরিবার-কর্তৃক নির্মিত দামোদরমন্দিরে দুজনের নাম পাওয়া যায়—শ্রী শ্রীরাম মিস্ত্রি, সাকিম রঘুনাথবাড়ি (চন্দ্রকোণার কাছে) এবং শ্রীভক্তরাম দাস মিস্ত্রি, সাকিম ইলমবাজার (চন্দ্রকোণার অন্তর্গত)।

উনিশ শতকে নতুন আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ হল। যেমন, মেদিনীপুরের (বিশেষত ঘাটাল মহকুমার) শৈলী, বীরভূম-বর্ধমানের শৈলী (বিশেষত অজয় নদের উপত্যকায়, বাঁকুড়াতেও পাওয়া যায়), এবং বাঁকুড়ার (পত্রসায়ের-বালসি) শৈলী—প্রধান রীতিগুলোর কয়েকটি। এমনকি একই জেলার মধ্যে শৈলীর বিস্ময়কর বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন বিষ্ণুপুরের নবরত্ন শ্রীধর মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের সঙ্গে সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের কাজের পার্থক্য,—এমনকি একই গ্রামের মধ্যে, যেমন ক্ষীরপাই-এ (মেদিনীপুর) মদনমোহন আর শিবমন্দিরের পোড়ামাটির কাজের বৈসাদৃশ্য। এর অর্থ একটা ভাঙচুর ও নতুনত্বের যুগ এসেছিল। কলকাতার আশেপাশে যেখানে ইংরেজপ্রভাব প্রবল। উনিশ শতকের শেষদিকে পোড়ামাটির কাজের চলন কমে আসতে লাগল, তার জায়গায় স্টুকোর কাজ এল, যেমন দক্ষিণেশ্বরে (১৮৫৫খৃ)। উনিশ শতকের হুগলি-হাওড়া-২৪ পরগণার পোড়ামাটির কাজ প্রায়ই উদ্দেশ্যবিহীন এবং স্থূল। শৈলীর দিক থেকেও নিতান্ত স্থানিক যেমন বড়িষায় কিংবা অদৃষ্টপূর্ব, যেমন সোমরার (হুগলি) আনন্দভৈরবী মন্দির, যা থেকে বোঝা যায় বিশেষ করে অন্য কাজের কারিগরকে (যেমন প্রতিমা তৈরি করে যেসব কুমোর) দিয়ে ঐসব কাজ করানো হয়েছে। পরিশেষে, এমনকি কুমোরদের ডাকা হয়েছে মেরামতির কাজ করানোর জন্য। একটু দূরের জায়গাগুলোতে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমে পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিশ শতক পর্যন্ত রয়ে গেল। আমার জানার মধ্যে সর্বশেষ বোধহয় ডেবরা থানার ধামতোর-এ শাসমল পরিবারের মন্দিরটি (১৯৩০খৃ)।

boipattor.in

এইভাবে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাসের একটা প্রাণময় ও মেজাজী পর্ব যখন শিল্প এসেছে মাটির কাছাকাছি, বিধিবদ্ধ অনুশাসন থেকে

কিছুটা মুক্ত। এখনো পর্যন্ত, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, শত শত মন্দির টিকে আছে, অবশ্য লুপ্ত হয়ে গেছে আরো বেশি সংখ্যক এবং অনেকগুলোই ধ্বংসপ্রায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মালিকদেরও আর্থিক সামর্থ্য কমেছে, তাঁদের মন্দিরের ব্যাপারে নজরও বিশেষ নেই, কাজেই দেওয়ালে ছাদে এখন সহজেই শেকড় গজাচ্ছে। শৌখিনবিলাসী পশ্চিমী প্রেরণায় শিল্প-ব্যবসায়ীরা লোক পাঠিয়ে ধ্বংসোন্মুখ দেওয়ালগুলো একেবারে খালি করে আনছে, এমনকি যেসব মন্দিরগুলো ভালো আছে সেগুলো থেকেও ফলক খুলে খুলে আনা হচ্ছে মালিকদের হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে (মেদিনীপুরের লাওডা-তে মন্দিরের নীচের একটা বড় ফলকের জন্য মূল্য ধরা হয়েছিল পাঁচশ টাকা)। কলকাতার বড়লোকরা দু চারটে মূর্তি হয়তো চালান করে দেয় তাদের গাড়ির পেছনে—বনভোজনের স্মৃতি। এমনকি তিরিশের যুগেও গুরুসদয় দত্ত তাঁর পরিচিত একজন 'পণ্ডিত'ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি 'দলবল নিয়ে গভীর রাতে অভিযানে বেরিয়েছিলেন কুড়ুল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি হাতে এবং অন্যত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটা মন্দিরের মূল্যবান সব ফলকগুলো খুলে খুলে এনেছিলেন…'। ইতিমধ্যেই এত জিনিশ নষ্ট হয়ে গেছে যে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার কোনো উপায়ই আর নেই। আগামীকালের গবেষকদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যদি গ্রামবাসীরা যাঁরা আজ শহুরে রাজনীতি এবং শহুরে জাঁকজমকের প্রভাবে নিজেদের উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁরা এর রসোপলব্ধি করতে ফিরে না যান।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ দি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ময়ুরভঞ্জ, ১ম খণ্ড, পৃ ১১।

২। জার্নাল অফ দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৩৮, পৃ ১৬৯।

৩। এ. এইচ. দানি ঃ মুসলিম আর্কিটেকচার অফ বেঙ্গল, পৃ ৬৮।

৪। এস. কে. সরস্বতী ঃ আরলি স্কাল্প্চার অফ বেঙ্গল, পৃ ১০৮।

৫। নীহাররঞ্জন রায় ঃ ঢাকা হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ ৫২৯।

চিত্রপরিচিতি ঃ

১। বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ঃ জোড়বাংলা মন্দির (১৬৫৫ খৃ)। প্রাচীন পোড়ামাটি-শিল্প-শৈলীর একটি উদাহরণ। একদল সংগীতশিল্পীকে দেখা যাচ্ছে, সুরমণ্ডল বাঁশি এবং মৃদঙ্গ বাদনরত।

২। থুপসরা (বীরভূম): শিবমন্দির (১৮৩৩ খৃ)। পরবর্তীকালের শৈলীর একটি উদাহরণ। রাম এবং সীতা সিংহাসনে আরোহণ করছেন, পাশে রামের ভ্রাতৃবৃন্দ, বশিষ্ঠমুনি, হনুমান এবং জাম্বুবান। নীচে যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে।

৩। আটপুর (হুগলি): রাধাগোবিন্দ মন্দির (১৭৮৬ খৃ)। হুগলির অষ্টাদশ-শতকী রীতির অবিকল উদাহরণ। ইওরোপীয় ঘোড়সওয়ার, এবং নাচের দলে পরিতুষ্ট একজন সাহেব।

৪। বড়নগর (মুর্শিদাবাদ): জোড়বাংলা শিবমন্দির। আঠারো শতকের শেষার্ধের এই শৈলী সম্ভবত মুর্শিদাবাদের হাতির-দাঁত-খোদাইকারীদের সৃষ্টি। ওপরের সারিতে রামলীলার দৃশ্য (তারকাবধ ইত্যাদি) এবং নীচের সারিতে পাল্কিবাহিত নৃপতি—একটি অবিকল সমসাময়িক দৃশ্য।

boipattor.in

(১)

boipattor.in

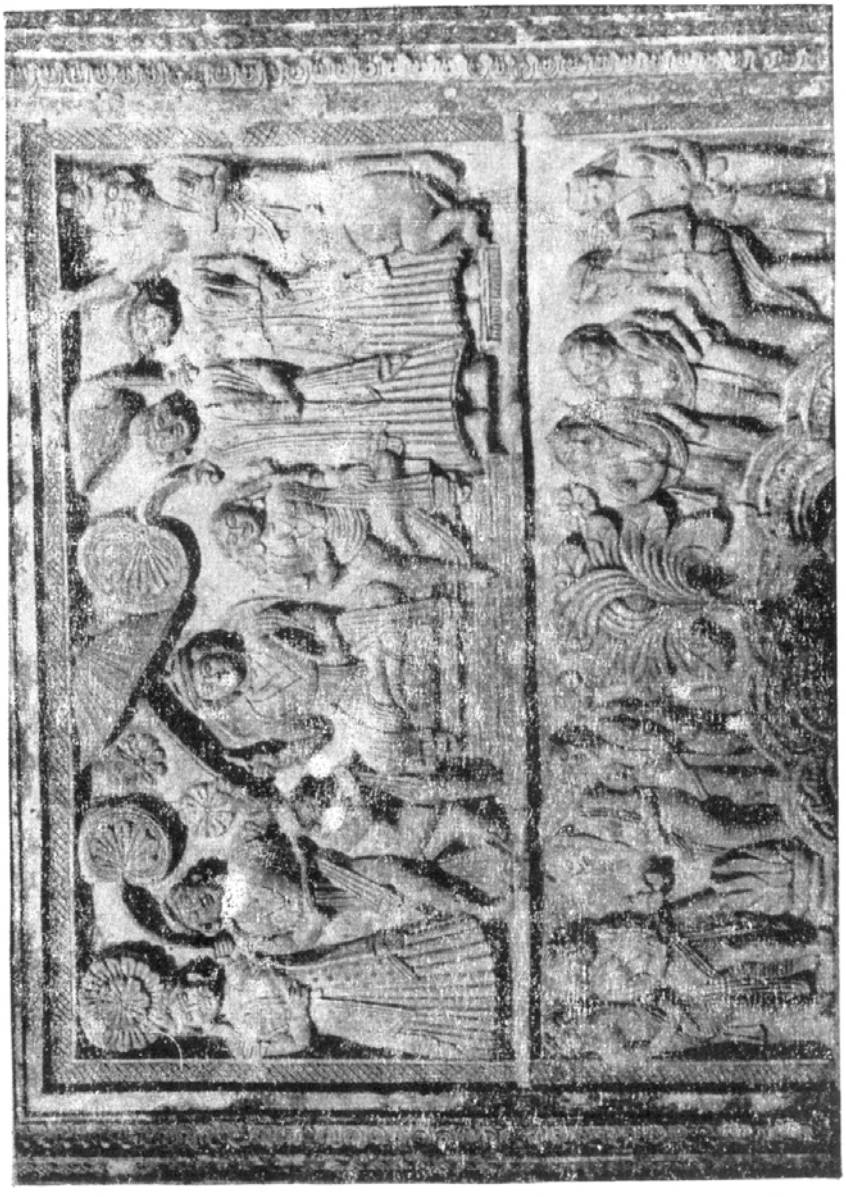

boipattor.in

boipattor.in

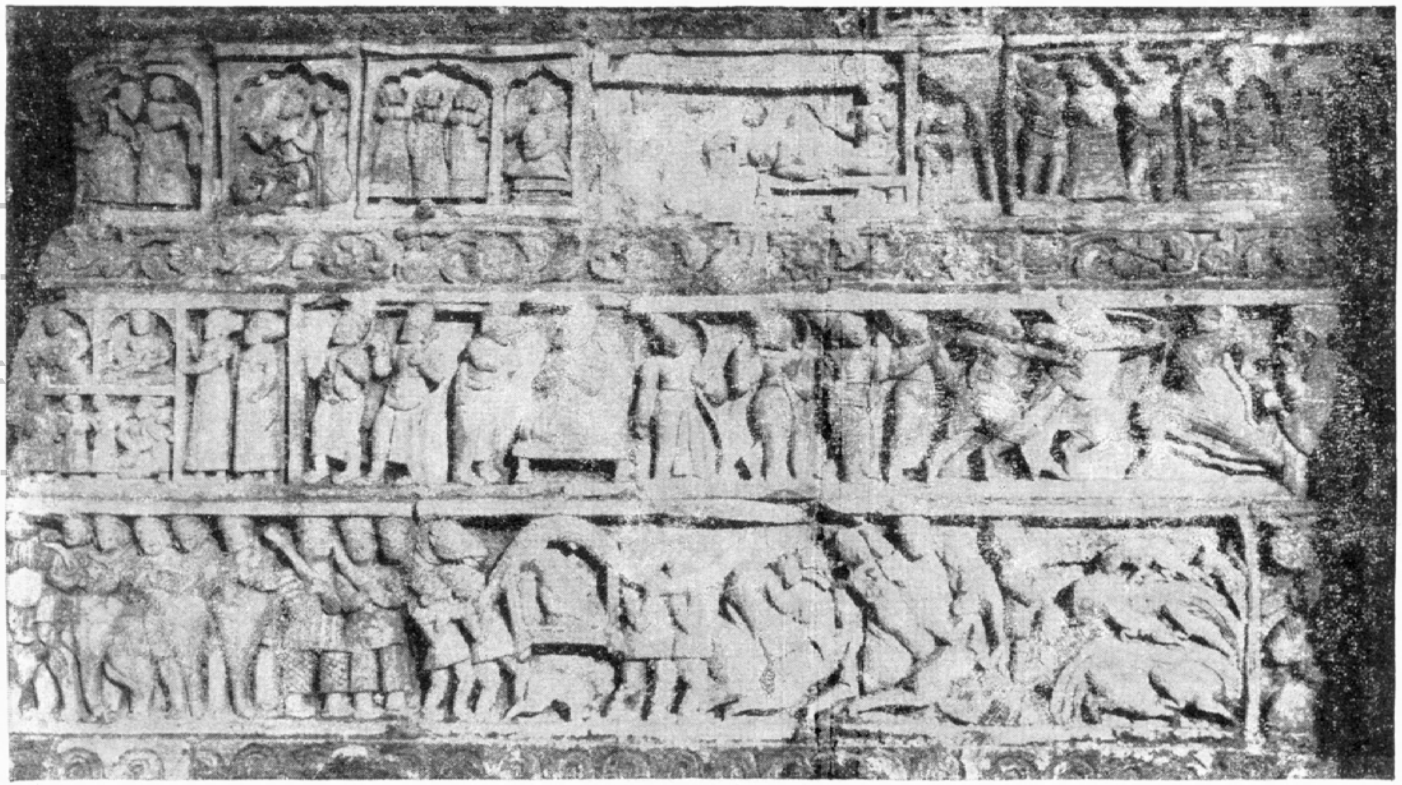

boipattor.in